দেশমাতৃকার অমর সন্তান তোমরা থাকবে স্মৃতিতে অম্লান



বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ ক্যাপ্টেন
মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর



বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ সিপাহী
হামিদুর রহমান



বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ সিপাহী
মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল



বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ ইআরএ-১
মো: রুহুল আমিন



বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট
মতিউর রহমান



বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ ল্যান্স নায়েক
মুন্সী আব্দুর রউফ



বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ ল্যান্স নায়েক
নূর মোহাম্মদ শেখ

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী দেশের জন্য নিবেদিত সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ

দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সদা প্রস্তুত বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী

সেনাবাহিনী: 'সমরে আমরা, শান্তিতে আমরা, সর্বত্র আমরা দেশের তরে'-এই মূলমন্ত্রে দীক্ষিত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা। দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতা রক্ষার উদ্দেশ্যে বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ব্যাপ্তি বৃদ্ধির পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্র সংযোজন করে অপারেশনাল সক্ষমতাকে বহুলাংশে বৃদ্ধি করা হয়েছে। জাতির পিতা প্রণীত প্রতিরক্ষা নীতি ১৯৭৪ এর আলোকে একটি আধুনিক ও চৌকশ সেনাবাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ফোর্সেস গোল-২০৩০ প্রণয়ন করা হয় ২০০৯ সালে যা ২০১৭ সালে সংশোধিত হয়। এরই বাস্তবায়নে সিলেটে ১৭ পদাতিক ডিভিশন, রামুতে ১০ পদাতিক ডিভিশন, টাঙ্গাইলে বঙ্গবন্ধু সেনানিবাস এবং লেবুখালীতে ৭ পদাতিক ডিভিশন ও শেখ হাসিনা সেনানিবাস প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পদ্মা সেতুর নির্মাণ তদারকি ও নিরাপত্তার জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ৯৯ কম্পোজিট ব্রিগেড। এছাড়াও ২টি স্পেশাল ওয়ার্কস অর্গানাইজেশন, ২২টি ব্যাটালিয়ন এবং বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টাল সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ২টি ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটালিয়নকে প্যারা ব্যাটালিয়ন এবং ৮টি ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটালিয়নকে মেকানাইজড ব্যাটালিয়নে রূপান্তর করাসহ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে সংযোজিত হয়েছে ১টি এয়ার ডিফেন্স আর্টিলারী ব্রিগেড। এছাড়াও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে প্রথমবারের মত গঠন করা হয়েছে প্যারা কমান্ডো ব্রিগেড। পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিয়োজিত সেনাসদস্যদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে লালমনিরহাট ও চট্টগ্রামে পৃথক দুটি এভিয়েশন বেস এবং চট্টগ্রামে আর্মি এভিয়েশন ফরওয়ার্ড বেস নির্মাণ করা হয়েছে।

নৌবাহিনী: বাংলাদেশ নৌবাহিনী প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই 'শান্তিতে সংগ্রামে সমুদ্রে দুর্জয়' এই মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সদাজাগ্রত ও সদাপ্রস্তুত রয়েছে। দেশের অপার সমুদ্রসম্পদ আর সার্বভৌমত্ব রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব পালনে ফোর্সেস গোল ২০৩০ এর আলোকে নৌবাহিনী আজ একটি পেশাদার শক্তিশালী ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনীতে পরিণত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অসামান্য প্রজ্ঞা ও দিক-নির্দেশনায় নৌবাহিনীতে সংযোজিত হয়েছে দুটি আধুনিক সাবমেরিন বানৌজা নবযাত্রা ও জয়যাত্রা, আধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধজাহাজ-ফ্রিগেট, করভেট, লার্জ প্যাট্রোল ক্রাফট, জরিপ জাহাজ ও বিশেষ নৌকমান্ডো দল সোয়াড্স। এছাড়া সমুদ্রে জরুরি উদ্ধার ও টহল পরিচালনার জন্য নৌবহরে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে মেরিটাইম প্যাট্রোল এয়ারক্রাফট ও হেলিকপ্টার সুবিধা সম্বলিত নেভাল এভিয়েশন। পাশাপাশি নৌবাহিনীর কলেবর ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কুতুবদিয়াস্থ পেকুয়ায় সাবমেরিন ঘাঁটি 'বানৌজা শেখ হাসিনা', ঢাকার খিলক্ষেতে 'বানৌজা শেখ মুজিব' এবং পটুয়াখালীর কলাপাড়াস্থ রাবনাবাদ চ্যানেলের পার্শ্ববর্তী এলাকায় 'বানৌজা শের-ই-বাংলা' ঘাঁটি নির্মাণ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এছাড়াও, ০২টি করভেট বানৌজা সংগ্রাম ও বানৌজা প্রত্যাশা এবং ০২টি ফ্রিগেট বানৌজা ওমর ফারুক ও বানৌজা আবু উবাইদাহ নৌবহরে সংযোজনের মাধ্যমে নৌবাহিনীর সক্ষমতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিমান বাহিনী: 'বাংলার আকাশ রাখিব মুক্ত' এ মূলমন্ত্রে উদ্দীপ্ত বাংলাদেশ বিমান বাহিনী আকাশসীমা রক্ষার মাধ্যমে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব বজায় রাখতে সর্বদা নিয়োজিত। স্বাধীনতার পরপরই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতায় তৎকালীন অত্যাধুনিক সুপারসনিক যুদ্ধবিমান, পরিবহন বিমান, হেলিকপ্টার ও এয়ার ডিফেন্স রাডার সংযোজনের মাধ্যমে একটি আধুনিক ও শক্তিশালী বিমান বাহিনীর যাত্রা শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় MiG-29 যুদ্ধবিমান, F-7 BGI যুদ্ধবিমান, C-130 পরিবহন বিমান, Mi-171SH হেলিকপ্টার, AW-139 মেরিটাইম সার্চ এন্ড রেসকিউ হেলিকপ্টার, অত্যাধুনিক এয়ার ডিফেন্স র‍্যাডার, আবহাওয়া র‍্যাডার ও ক্ষেপণাস্ত্র সংযোজিত হয়। বৈমানিকগণের প্রশিক্ষণে উৎকর্ষ আনয়নের লক্ষ্যে সংযোজন করা হয়েছে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ বিমান ও সিমুলেটর। বিমান বাহিনীর সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নের অংশ হিসেবে বিভিন্ন ধরনের অত্যাধুনিক বিমান, র‍্যাডার, যুগোপযোগী সামরিক সরঞ্জাম সংযোজন এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। অত্যাধুনিক এসব সরঞ্জামের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে বিমান বাহিনীর প্রতিটি সদস্য দেশ ও জাতির ক্রান্তিলগ্নে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুন্ন রাখতে সদা প্রস্তুত।

দেশ সেবা ও অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমে সশস্ত্র বাহিনী

সেনাবাহিনী: বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিভিন্ন ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠ অবদান রেখেছে যেমন- দুর্যোগ মোকাবিলায়, সাভারে রানা প্লাজা ভবন ধ্বসে উদ্ধার অভিযান পরিচালনা ও জরুরি চিকিৎসা সেবা প্রদান, করোনা মোকাবিলায় বহুমুখী বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ গ্রহণ, স্বর্ণদ্বীপের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান, মানসম্মত শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদান, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিরাপত্তা বিধান, এমআরপি প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং অবকাঠামো উন্নয়নে বহুমূখী পদক্ষেপ গ্রহণ। 'অপারেশন কোভিড শিল্ড' নামের করোনাযুদ্ধে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সংক্রমণের শুরুতেই কোয়ারেন্টাইন সেন্টার পরিচালনা করা, সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করা, জনগণকে সচেতন করার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। করোনা মোকাবিলায় সরকারের নির্দেশনায় সম্মুখ সারির যোদ্ধা হিসেবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী দেশের প্রতিটি অঞ্চলে সাধারণ জনগণের মাঝে করোনা প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টি এবং বিদেশ থেকে আগত ব্যক্তিবর্গের জন্য কোয়ারেন্টাইন সেন্টার স্থাপন ও ব্যবস্থাপনাকল্পে কাজ করে যাচ্ছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশক্রমে সশস্ত্র বাহিনীর মাধ্যমে মহাখালীস্থ ডিএনসিসি আইসোলেশন সেন্টারকে ১০০০ শয্যার ডেডিকেটেড কোভিড-১৯ হাসপাতালে রূপান্তরিত করে বেসামরিক মুমূর্ষু রোগীদের জরুরি চিকিৎসা সেবা প্রদানের কার্যক্রম প্রদান করা হয়। সেনাসদস্য ও তাদের পরিবারের পাশাপাশি ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ৩২,৫২৭ জন সাধারণ জনগণকে প্রথম ডোজ এবং ২৬,৮২০ জনকে দ্বিতীয় ডোজ কোভিড টিকা প্রদান সম্পন্ন হয়েছে। স্বল্প সময়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সেনাসদস্য ও তাদের পরিবারের সদস্যগণকে ভ্যাক্সিনেশনের আওতায় আনায় সেনাসদস্যদের মাঝে করোনায় আক্রান্তের হার নিম্ন মাত্রায় রাখা সম্ভব হয়েছে। শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভূমিকা বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত। বর্তমানে বাংলাদেশ বৃহত্তম শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ হিসেবে বিশ্ব শান্তিরক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। গত তিন দশকে বাংলাদেশের গর্বিত শান্তিরক্ষীরা বিশ্বের ৪০ টি দেশে ৫৪ টি শান্তিরক্ষা অভিযান সম্পন্ন করেছেন। পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের নির্মাণ চলাকালীন নিরাপত্তা প্রদানের পাশাপাশি সেনাবাহিনী জাজিরা ও মাওয়া অ্যাপ্রোচ রোড, পদ্মা সেতু রেলসংযোগ প্রকল্প এবং ফ্যাসিলিটিজ সার্ভিস এরিয়ার কনস্ট্রাকশন সুপারভিশন কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করছে। শিক্ষার মানোন্নয়নে ও মানসম্মত শিক্ষা ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি), আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ (এএফএমসি), ক্যাডেট কলেজ, মিলিটারি কলেজিয়েট স্কুল, মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজি (এমআইএসটি), বাংলাদেশ আর্মি ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি (বিএইউএসটি), বাংলাদেশ আর্মি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি (বিএআইইউএসটি), বাংলাদেশ আর্মি ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যান্ড টেকনোলজি (বিএইউইটি) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা হচ্ছে।

নৌবাহিনী: দেশের যেকোনো প্রাকৃতিক ও নৌ দুর্ঘটনায় উদ্ধার অভিযান ও ত্রাণ-তৎপরতায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ, সরকারি দিকনির্দেশনায় 'ইন এইড টু সিভিল পাওয়ার' এর আওতায় উপকূলীয় অঞ্চলে ৬টি জেলার ১৯টি উপজেলা জুড়ে দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের মাঝে মানবিক সহায়তা ও খাদ্যসামগ্রী বিতরণ, ঘূর্ণিঝড় 'ইয়াস' পরবর্তী সময়ে সমুদ্র ও উপকূলীয় এলাকায় নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ, মেরিটাইম প্যাট্রোল ও হেলিকপ্টার এর মাধ্যমে উদ্ধার, ত্রাণ ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদান, ১৯৯৭ হতে দেশের ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল অসহায় দরিদ্র পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে আশ্রয়ণ-২ নামে প্রকল্প বাস্তবায়ন, মৎস্য সম্পদ রক্ষায় দেশের বিভিন্ন জেলার নদ-নদীতে অপারেশন জাটকা পরিচালনা, আঞ্চলিক সন্ত্রাসবিরোধী কার্যক্রমে ও জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে যুক্ত হয়ে নৌবাহিনী বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় অসামান্য ভূমিকা রাখছে। শিক্ষা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে নৌবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি দেশের ব্লু ইকোনোমি বাস্তবায়ন ও দক্ষ জনবল তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এর পাশাপাশি নৌবাহিনী 'আশার আলো' প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছে যা একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। চট্টগ্রামস্থ মেরিন ফিশারিজ একাডেমির শিক্ষা কার্যক্রম অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পরিচালনা করে আসছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। এছাড়া মায়ানমারের বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা নাগরিকদের জন্য স্বল্পতম সময়ে নোয়াখালীর ভাসানচরে ০১ লক্ষ রোহিঙ্গাদের সাময়িক আশ্রয় প্রদানের জন্য আন্তর্জাতিক মানের অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে যা পরবর্তীতে দেশের দুঃস্থ জনগোষ্ঠীর বসবাসের জন্য ব্যবহার করা হবে। দেশের সমুদ্রসীমা নিরাপদ রাখার পাশাপাশি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সদস্যরা এ পর্যন্ত ৩০টি দেশে শান্তিরক্ষা মিশনে অত্যন্ত দক্ষতা, নিষ্ঠা, দায়িত্ববোধ ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। জাতিসংঘের অধীনস্থ মেরিটাইম টাস্কফোর্সের আওতায় উপমহাদেশের মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাহাজ লেবানীজ জলসীমায় ২০১০ সাল হতে মেরিটাইম ইন্টারডিকশন অপারেশন পরিচালনা করে আসছে। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ফোর্স মেরিন ইউনিট দক্ষিণ সুদানের নীলনদে 'অপারেশন লাইফলাইন' পরিচালনা করে জাতিসংঘের জরুরি খাদ্য, চিকিৎসাসহ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে শান্তিরক্ষায় অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। শান্তিরক্ষা মিশন থেকে অর্জিত রেমিট্যান্স এদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি অন্যতম প্রধান উৎস যা এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। নৌবাহিনীর দক্ষ পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানে বর্তমানে খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড, ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস, নারায়ণগঞ্জ এবং চট্টগ্রাম ড্রাইডক লিমিটেড সমূহে নির্মিত প্যাট্রোল ক্রাফট, লার্জ প্যাট্রোল ক্রাফট, সার্ভে বোট, অয়েল ট্যাংকার, প্যাসেঞ্জার ভেসেল, ল্যান্ডিং ক্রাফট, বিশেষায়িত টাগ বোট ও ফেরিসহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক যুদ্ধজাহাজ বাংলাদেশ নৌবাহিনীসহ দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত হচ্ছে। দেশীয় শিপইয়ার্ডে যুদ্ধজাহাজ নির্মাণের সাফল্য ও ধারাবাহিকতায় দেশে প্রথমবারের মতো চট্টগ্রাম ড্রাইডক লিমিটেড কর্তৃক ফ্রিগেট নির্মাণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিশেষ ক্রোড়পত্র

বিমান বাহিনী: দেশ ও জাতির প্রয়োজনে জাতীয় দুর্যোগ মোকাবেলা, নিয়মিতভাবে দেশের বেসামরিক প্রশাসনকে বিমান বাহিনী কর্তৃক সর্বাত্মক সহযোগিতার মাধ্যমে উদ্ধার ও অগ্নিনির্বাপণে সহায়তা প্রদান, পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলের শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষায় সেনাবাহিনী বিজিবিসহ অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এবং বেসামরিক প্রশাসনের কার্যক্রমের সাথে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ, বাংলাদেশ আকাশ প্রতিরক্ষা শনাক্তকরণ অঞ্চল নির্ধারণের মাধ্যমে দেশের আকাশ প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করছে। নারীর ক্ষমতায়নে বিমান বাহিনী সক্রিয় ভূমিকা রাখছে। এছাড়া, বিমান বাহিনী পরিচালিত স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় দেশের শিক্ষা প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাছাড়াও দেশের সেবামূলক বিভিন্ন কর্মকান্ডে বিমান বাহিনীর রয়েছে বস্তুনিষ্ঠ অবদান। জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনসমূহে প্রত্যন্ত এলাকায় হেলিকপ্টারের সাহায্যে ভোটার তালিকা প্রণয়নসহ ভোট গ্রহণ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় লোকবল ও সরঞ্জামাদি পরিবহন করে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনায় নিয়মিতভাবে সহায়তা করে আসছে বিমান বাহিনী। গত ০৯ আগষ্ট ২০২০ -এ লেবাননের বৈরুতে ভয়াবহ বিস্ফোরণের পর বিমান বাহিনীর পরিবহন বিমানে মানবিক সহায়তা প্রেরণ করা হয়। জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলা বিশেষ করে বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধকল্পে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত নীতিমালা অনুসরণ করে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী রোগী পরিবহন, চিকিৎসা সহায়ক সামগ্রী প্রদান, বিমান বাহিনী স্থাপনা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় জীবাণুনাশক ছিটানো, সচেতনতা সৃষ্টি এবং দরিদ্রদের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ অব্যাহত রেখেছে। এছাড়াও বিমান বাহিনীর পরিবহন বিমানের সাহায্যে চীন ও দক্ষিণ কোরিয়া থেকে করোনা ভাইরাস সনাক্তকারী কীট, পিপিই-সহ চিকিৎসা সহায়ক সামগ্রী সংগ্রহ করা হয়। তাছাড়া, করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে আটকেপড়া মালদ্বীপ ও বাংলাদেশের নাগরিকদের নিজ নিজ দেশে প্রেরণের পাশাপাশি মালদ্বীপে অবস্থানরত বাংলাদেশিদের করোনার চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য বিমান বাহিনীর পরিবহন বিমানের মাধ্যমে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর একটি মেডিকেল টিম প্রেরণ করা হয়। ভূমিকম্প পরবর্তী উদ্ধার কাজে ঢাকা শহরের ৯টি সেক্টরের মধ্যে ২টি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরের দায়িত্ব বিমান বাহিনীর উপর ন্যস্ত রয়েছে। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ১৯৯৩ সালের ২১শে জানুয়ারি বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সদস্যগণ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের আওতায় প্রথম United Nations Protection Force-এ ইউরোপের বসনিয়া-হার্জেগোভিনায় গমন করেন। সেই থেকে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর শান্তিরক্ষীরা জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নিজ দায়িত্ব পালন ছাড়াও বিভিন্ন জনহিতকর কাজ সম্পাদন করে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছেন।

২১ নভেম্বর: জাতীয় ঐক্যের প্রেরণা শক্তি

মেজর কামাল আতাউর রহমান, এইসি



২১ নভেম্বর বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী দিবস, বাঙালি জাতির ইতিহাসে একটি হিরন্ময় দিন। আমাদের জাতীয় জীবনে সশস্ত্র বাহিনী দিবসের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। মুক্তিযুদ্ধকালীন ১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর যেমন স্বাধীনতা উন্মুখ একটি জাতির গোড়াপত্তনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, তেমনি স্বাধীনতা উত্তরকালীন বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব সুরক্ষা, সামরিক সক্ষমতা অর্জন ও রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতা রক্ষার মাধ্যমে সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার আভাস এতে নিহিত রয়েছে। ১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর তারিখে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত মুহূর্তে এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে দখলদার পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সমন্বয়ে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলে এবং সেই আঙ্গিকে সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে যুদ্ধ পরিচালনা করা হয়। যার ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন ত্বরান্বিত হয়েছিল। সশস্ত্র বাহিনী গঠনের পর সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী এবং যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বিত যুগপৎ আক্রমণের ফলে পেশাদার শক্তিশালী পাকিস্তানি বাহিনীকে পরাজিত করার মধ্য দিয়ে দ্রুত বিজয় অর্জিত হয়েছিল। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালীন সশস্ত্র বাহিনী গঠনের মূল সুর ছিল ঐক্যের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে শত্রুর সমন্বিত শক্তির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ করে স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করা অর্থাৎ ২১ নভেম্বরের মূল মন্ত্র ছিল 'ঐক্যই শক্তি'। বাঙালির স্বাধীনতা যুদ্ধের ফলাফল, পাকিস্তানি বাহিনীর পরিণতি এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সশস্ত্র বাহিনীর সমন্বিত অগ্রযাত্রার ইতিহাসের মাধ্যমে আজ এ কথা উচ্চ কণ্ঠে বলা যায়, ১৯৭১ সালে ২১ নভেম্বর তারিখে সশস্ত্র বাহিনী গঠন ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসের এক বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত। সশস্ত্র বাহিনী দিবস এর আদর্শিক দিকটা বিবেচনায় রেখে ভবিষ্যতেও সমন্বিত কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে বাহিনীসমূহের নিজস্ব উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী এর উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন সম্ভব হবে এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব সুরক্ষিত থাকবে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার চূড়ান্ত ঘোষণা দিয়ে (তৎকালিন পূর্ব পাকিস্তানের) বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণকে স্বাধীনতাযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে নির্দেশ দেন। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টসমূহের বাঙালি সেনাসদস্যরা সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে বের হয়ে এসে নতুন করে সংঘবদ্ধ হয়ে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করে। অন্যদিকে, অন্যান্য সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনীর বাঙালি সদস্যগণ, বাংলার ছাত্র, শিক্ষক, চাকুরিজীবী, বিভিন্ন পেশাজীবী, ব্যবসায়ী, শ্রমিক, নারীসহ নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ বাঙালি সৈনিকদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন। প্রাথমিক অবস্থায় অসংগঠিত এ সকল মুক্তিকামী মানুষ সীমান্ত পাড়ি দিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে গিয়ে সেনাবাহিনীর অধীনে সামরিক যুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে সামরিক কাঠামোর অধীনে থেকে দেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে শত্রু বাহিনীর উপর বিচ্ছিন্ন আক্রমণের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ শুরু করে। প্রাথমিক পর্যায়ে ছোট ছোট দলের রেইড, এ্যাম্বুশ ও গেরিলা যুদ্ধের মধ্যে মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধ সীমাবদ্ধ ছিল। মুক্তিযুদ্ধে গতি বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ১৯৭১ সালের ১২ জুলাই সিনিয়র সামরিক কমান্ডারগণের মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সমগ্র বাংলাদেশকে ১১ টি সেক্টরে অর্থাৎ ১১ টি সামরিক অঞ্চলে বিভক্ত করে দায়িত্বপূর্ণ এলাকা সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। সেক্টর গঠনের পর উদ্যমী মুক্তিযোদ্ধাগণ শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু করে। এক্ষেত্রে দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় প্রধান্য বিস্তারের জন্য প্রত্যেকটি সেক্টরকে আবার বেশ কয়েকটি সাব-সেক্টরে বিভক্ত করে একেকজন অফিসারকে একেকটা সাব-সেক্টরের দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়। এর ফলে মুক্তিযুদ্ধে গতিশীলতা অর্জিত হয়েছিল। নিঃসন্দেহে সামরিক সেক্টর ও সাব-সেক্টর গঠন মুক্তিযুদ্ধের সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। সেক্টর গঠনের পর দখলদার শত্রুবাহিনীর উপর মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। প্রত্যেক সেক্টরের সাব-সেক্টরসমূহ হতে দখলদার পাকিস্তানিদের উপর নিয়মিত সংগঠিত আক্রমণ পরিচালনা করে শত্রুর জান-মালের ক্ষতিসাধন করা হলেও শত্রুকে অবস্থানচ্যুত করা বা পিছু হাটানো সম্ভব হচ্ছিল না। একথা অনস্বীকার্য যে, গেরিলা যুদ্ধ কখনোই প্রচলিত যুদ্ধের (Conventional War) বিকল্প হতে পারে না। এই উপলব্ধি থেকে সর্বাত্মক যুদ্ধের জন্য প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশ মত উর্ধ্বতন সামরিক কমান্ডারগণ সেক্টরের পাশাপাশি তিনটি ব্রিগেড বা ফোর্স এর অধীনে বৃহৎ পরিসরে প্রচলিত যুদ্ধ পরিচালনা করেন। এমন পরিস্থিতিতে যুদ্ধকে আরো বেগবান করার প্রয়াসে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সমন্বয়ে ১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর গঠন করা হয় বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সশস্ত্র বাহিনী গঠন ছিল একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। সেক্টর গঠনের পর থেকেই যুদ্ধের সংগঠন অনুসারে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী সামরিক কমান্ডারগণ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অধীনে নিজ নিজ দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় অর্থাৎ যুগপৎভাবে সমগ্র বাংলাদেশে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রাণপণে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধের কমান্ডার-ইন-চিফ এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ১০ নম্বর সেক্টরের ৫১৫ জন নৌ কমান্ডো শত্রুর শক্তিশালী নৌবাহিনীকে ধ্বংস করার প্রত্যয়ে সকল ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলো। উল্লেখ্য, নদীমাতৃক বাংলাদেশে জনবল, মালামাল/রসদ সরবরাহের ক্ষেত্রে নৌপথগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো। অন্য দিকে সমুদ্র বন্দরগুলো পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সামরিক সংরঞ্জাম, যেমন গোলাবারুদ, অস্ত্র এমনকি পাকিস্তান থেকে সৈনিকদের বহন করে আনার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হত। পাকিস্তানি নৌবাহিনী এবং নৌ ও সমুদ্র বন্দরসমূহকে সম্পূর্ণরূপে অকার্যকর ও ধ্বংস করার লক্ষ্যে বৃহত্তর পরিকল্পনা গ্রহণ করে লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত ছিল। ততদিনে বন্ধুদেশ ভারতের সহায়তায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনী গঠন শেষে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ছিল চলমান। এরপরও চূড়ান্ত বিজয় যেনো ছিলো সুদূর পরাহত। শত্রুর নির্মম বুলেটের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়ানো অসীম সাহসী মুক্তিযোদ্ধ